দুইশ পঞ্চাশ

অন্তিক মাহমুদ

অধ্যয়ন
একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

দুইশ পঞ্চাশ
অন্তিক মাহমুদ

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অধ্যয়ন: ১১৪

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
অন্তিক মাহমুদ

বর্ণ বিন্যাস
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য: ৬০০.০০

Duisho Ponchash
By: Antik Mahmud
First Published: February 2023 by Tasnova Adiba Shanjute
Addhayan Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 600.00 $12

ISBN: 978-984-95982-8-2

আগে লেখক কিছু বলতে চায়

আমার আশপাশে ইদানীং বিভিন্ন ধরনের মানুষ ঘোরা ফেরা করছে। বিভিন্ন মানুষ আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। নতুন নতুন কিছু শিখায়। সত্যি বলতে এই বইয়ের মূল চরিত্রগুলো এরকমই কিছু বাস্তব জীবনের মানুষ আর শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত চরিত্র। প্রতিটা চরিত্রই আমার খুব কাছের।

আমি একটু লাজুক স্বভাবের মানুষ। তাই আমি হয়তোবা সাহস করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলতে পারবো না। কিন্তু আমি এখানে তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার জীবনে আসার জন্য। ধন্যবাদ জানাতে চাই নিজের অজান্তেই আমার জীবনে এত বড়ো অবদান রাখার জন্য। তোমরা/আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছো/দিয়েছেন। নতুন করে সবকিছু দেখতে শিখিয়েছেন।

এই গল্প লেখার আগে আমি দুবছরের একটা বিরতি নেই। আমি চাইনি প্রতিবছর জোর করে যা মন চায় তা নিয়েই একটা গল্প বানিয়ে দিয়ে দেই। সময় নিতে চেয়েছিলাম। আর সেই সময়ের মধ্যেই আমার এই গল্পের আইডিয়া মাথায় আসে। আইডিয়াটা আমি আগে টুকে নিই। এরপর আশপাশের সেই বাস্তব চরিত্রগুলো সেখানে থাকলে কী করতো তা চিন্তা করি। দেখতে পাই গল্পটা খুবই সুন্দর কিছু মোড় নিয়ে আগাচ্ছে। ব্যস! লিখতে বসে যাই পুরোদমে।

প্রতি গল্পেই আমি চেষ্টা করি আগের গল্পের ভুলগুলো থেকে কিছু শিখে নতুন করে ভালো কিছু লিখার। এবারও ব্যাতিক্রম নয়। গতবার তিন বইয়ে মনে হয়েছে গল্পটাই এত প্রাধান্য পেয়েছে যে চরিত্রগুলো সেভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। কিন্তু এবার চেষ্টা করেছি গল্পকেও প্রাধান্য দেয়ার, আবার চরিত্রগুলোর মধ্যেও একটা জীবন দেওয়ার। চরিত্রগুলো যেন গল্প নিয়েই পড়ে না থাকে। নিজেদের মধ্যেও যেন কথাবার্তা বলে।

বইটা এক বছর সময় নিয়ে আস্তে ধীরে লিখার সময় দুইটা জিনিস মাথায় রেখেছি। এক, আমি চেয়েছি চরিত্রগুলোর কোনো কথাই যেন ফেলনা না হয়। সবকিছুই যেন গল্পকে প্রভাবিত করে। আর দুই, গল্পটা পড়লে বুঝবেন আমি গল্পটা অনেকটা স্ক্রিপ্টের মতো করে লিখেছি। মানে ক্যামেরার সামনে যদি না আনা যায় তা হলে সেটা আমি গল্পে লিখিনি বা বলা যায় চেষ্টা করেছি না লিখার। আমি চাই আপনি গল্পের মধ্যে ডুবে না গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলোর পাশে দাঁড়ান। গল্পের চরিত্রগুলো কী অনুভব করছে সেটা বাইরে থেকেই যতখানি সম্ভব বুঝার চেষ্টা করুন।

সব গল্প ইউটিউবে বলা যায় না।

তবে সব গল্প অনুভব করা যায়।

অন্তিক মাহমুদ

২৪.১১.২০২২

উৎসর্গ

লিনু আন্টিকে। প্রথম বই উৎসর্গ করেছিলাম আমার 'আসল' আম্মুকে। তার পরেরটা আমার চাচি কে, যে আমাকে মায়ের মতো আমার কাজে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

তাই এবার করছি আমার খালা কে। ঢাকায় চলে আসার পর আমার মা এর অভাব অনুভব করতে দেয়নি যে। মাঝে মধ্যে মনে হয় তাকে আমি উলটা আরও বেশি ঝামেলায় ফেলেছি।

বইটি পড়ার নিয়ম

গল্পে অনেকগুলো অধ্যায় আছে। কিছু কিছু অধ্যায় স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু অধ্যায়ের শেষে আপনাকে কয়েকটি অপশন দেওয়া হবে। যেই অপশন আপনাকে সাহায্য করবে গল্পটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আপনার ডিসিশন গল্পে প্রভাব ফেলবে। বলতে গেলে আপনার সিদ্ধান্তই গল্পের বিভিন্ন ইতি আনতে সক্ষম।

যেসব অধ্যায়ে অপশন আছে, সেসব অধ্যায়ের অপশনগুলোর পাশে পরবর্তীতে সেই অপশন সিলেক্ট করার জন্য কোন অধ্যায়ে যেতে হবে সেটা উল্লেখ করা আছে। উদাহরণস্বরূপ– যদি আপনি কোনো অধ্যায়ের শেষে অপশন '১', '২', '৩'-এর মধ্যে অপশন '১' নেন এবং তার পাশে যদি বলা থাকে অধ্যায় ৪-এ যান, গল্পকে সামনে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আপনি গল্পের অধ্যায় ২, ৩ বাদ দিয়ে সরাসরি ৪-এ যাবেন। আর যেসব অধ্যায়ের শেষে কোনো প্রকার অপশন নেই সেই সব অধ্যায় শেষ করার পরে আপনি স্বাভাবিক যেভাবে বই পড়েন সেভাবেই পরবর্তী অধ্যায় পড়বেন।

আশা করি নিয়মটা খুব একটা কঠিন না। আর কঠিন হলে আমি দুঃখিত।

অন্ধকার

দশ পনেরো বছরের একটা ছেলে চৌরাস্তার একটা কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। পড়নে একটা হাফহাতা শার্ট, সাদামাটা হাফ প্যান্ট। খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে কেঁদে দিবে।

ছেলেটার সামনে চৌরাস্তার মোড়েই একটা পাজেরো গাড়ি খুবই অদ্ভুতভাবে শূন্যে বাঁকা হয়ে আটকে আছে। পাশে একটা ট্রাকও একইভাবে আটকে আছে। আচ্ছা না! ছেলেটার আশপাশের সবকিছুই যেন থমকে আছে। সামনের দিকটা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সেই ট্রাক, মানুষ, শহরে হাতে গোনা গাছপালা যাই আছে কিনা, আকাশের পাখি– সব; সবই থেমে আছে। খালি আটকে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে একটা অজানা বিস্ময় দেখা যাচ্ছে। সবাই তাকিয়ে আছে শূন্যে ভেসে থাকা গাড়িটার দিকে।

ছেলেটাও শূন্যে ভেসে থাকা গাড়ির ভেতর তাকালো। ড্রাইভিং সিটে এক মহিলা। এলোমেলো চুলের আড়ালে চেহারা দেখা না গেলেও চুলের ফাঁকফোকরে রক্ত দেখা যাচ্ছে, গড়িয়ে পড়তে যেয়েও যেন থেমে গেছে । শূন্যে আটকে থাকা বিন্দুবিন্দু রক্তও কেমন জানি গা শিরশিরে অনুভূতি দেয়।

ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে তাকালো ছেলেটি। চশমা পড়া মধ্যবয়সী একজন লোক মহিলাটিকে ধরে টানার চেষ্টা করছে। ছেলেটা বুঝলো না কেন, তবে বুঝতে পারে লোকটা স্পষ্টতই তাতে ব্যর্থ হচ্ছে। লোকটা নিজেও তা বুঝতে পেরে গাড়ির ফ্রন্ট ভিউয়ে ছেলেটার দিকে তাকালো।

একটা মুচকি হাসি দিয়ে ছেলেটাকে বুঝিয়ে দিলো সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন, সমস্যা নেই। দুজনের চোখই কোনো অজানা কারণে ছলছল করছিলো।

এরপরেই সে অন্ধকারে ডুবে যায়।

সময় কারো জন্য সুযোগ,

কারো জন্য সাজা।

কষ্টটা সময়ের সাথেই কেটে যাওয়ার কথা,

কিন্তু সময়ই যদি না কাটে...তখন?

সচ্ছল

"শ্রাবণী, ক্যাচ!" হঠাৎ পাশ থেকে কেউ চিৎকার দিলো। শ্রাবণী সাথে সাথে ভয়ে দুই পা লাফ দিয়ে সরলেও ফুটবলটা খুব জোরে তার গায়ে এসে লাগে।

"আউ! কুত্তা!" শ্রাবণী ব্যথায় আর রাগে চিৎকার দিয়ে উঠে।

ভার্সিটির বিল্ডিংয়ে ঘেরা মাঝখানের খোলা জায়গায় প্রায়ই ফুটবল খেলে রিফাতরা। আর প্রতিবারই ক্লাস শেষে যখন ঐ জায়গা দিয়ে শ্রাবণী হেঁটে যায়, কোনো এক কারণে রিফাত "ভুলে" বলে কিক করে ফেলে, আর "ভুলে" ঐ বল শ্রাবণীর গায়ে এসে লাগে। শুরুর দিকে শ্রাবণী পাত্তা দিতো না। আর তাতেই মনে হচ্ছে এখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

"সমস্যা কীরে তোর?" রাগে শ্রাবণীর মুখ লাল হয়ে আছে। রিফাত আর তার চ্যালাপ্যালারাও ভয় পায় না শ্রাবণীকে। খুবই বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে আসলো তারা।

"আমি সরি।" রিফাত বললো। মুখে এখনো ব্যাঙ্গাত্মক হাসির ছায়া।

"আরেকবার যদি গায়ে বল লাগে, মাইরা রাস্তায় ফালায় রাখবো বলে দিলাম।" শ্রাবণী একটু উঁচু হয়ে রিফাতের বরাবর হতে চাইলো।

"ওমা! তুই না টমবয়? সামান্য একটা বল গায়ে লাগলেই যদি এমন করিস–"

কথা শেষ করতেও পারলো না রিফাত। তার আগেই ধড়াম করে একটা ঘুসি মেরে বসলো শ্রাবণী। অপ্রস্তুত থাকায় রিফাত মাটিতে আছড়ে পরে।

রিফাতের এক সঙ্গী শ্রাবণীর কাঁধে ধাক্কা মারতে এগিয়ে আসে । তার আগেই শ্রাবণী ছেলেটার হাত খপ করে ধরে তলপেট বরাবর লাথি মারে। এরপর ওকে ঘুরিয়ে ছুড়ে মারে আরেকজনের বরাবর।

"শ্রাবণী, থামেন।"

দূর থেকে আবছাভাবে কে জানি থামতে বলছে। শ্রাবণী পাত্তা দিলো না। আরেকজনকে আপারকাট মেরে ফেলে দিলো মেঝে তে।

"শ্রাবণী!"

টাইম নাই। ধুম ধাম পিটাচ্ছে ছেলেগুলাকে সে।

"শ্রাবণী! এনাফ!" পিছন থেকে কেউ একজন শ্রাবণীর ডান হাতটা ধরে।

এত বড়ো সাহস! শ্রাবণী চোখ বন্ধ করে ঘুরিয়ে বাম হাতের উলটো পিঠ দিয়ে থাপ্পড় মেরে বসে ছেলেটাকে।

আশপাশ হুট করেই থমকে যায়। সবাই চুপ। যেই ছেলেটাকে মেরেছে, সে চোখ ছানাবড়া করে শ্রাবণীর দিকে তাকিয়ে আছে।

ওটা ছেলে না, লোক।

যেনতেন লোক না। তাদের প্রক্টর স্যার।

* * *

প্রক্টর স্যারের চোখ এখনো ছানাবড়া হয়ে আছে। পার্থক্য হলো, মাঠের বদলে এখন শ্রাবণী প্রক্টরের রুমে। আশেপাশে রিফাতদের দলের ছেলেদের বদলে শ্রাবণীর পাশে একজন পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সি লোক। লোকটার চোখমুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে, কেনই বা সে এখানে বসে আছে।

"আপনি এত শর্ট নোটিশে এসেছেন এজন্য ধন্যবাদ।" প্রক্টর শ্রাবণীর পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললো।

"জে।" লোকটা বললো। শ্রাবণী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। চিনে নাই স্যার লোকটাকে।

"আপনার মেয়ের আচার আচরণ ইদানীং বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা।"

"ও পড়ালেখাতেও অমনোযোগী।"

"জে।"

"শ্রাবণী এখন আমাদের ভার্সিটির আইকনিক প্রব্লেমেটিক স্টুডেন্ট। অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ওর নামে কমপ্লেইন আসে।"

"আসসা।"

"আচ্ছা মানে?" বলতে বলতে প্রক্টর ক্ষেপেই উঠলো, "আপনি কী সামান্যতম কেয়ার করেন আপনার মেয়ে এখানে কী কী করে বেড়ায়?"

"না।" লোকটা ডানে বামে তাকিয়ে এমনভাবে না বললো, যেন সে নিজেই অবাক কেউ এই স্বাভাবিক জিনিসটা কেন জানে না।

"না মানে! আপনি কেমন বাবা!" স্যার এখন প্রায় চেয়ার থেকে উঠেই যায়।

শ্রাবণী কপালে হাত দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হতাশ সে।

"আমি তো আপার আব্বা না।" লোকটা বললো।

প্রক্টর স্যার অবাক।

"সরি?" স্যার সিওর হয়ে নিচ্ছে ভুল শুনলো কি না।

"জে। আমি আপার ড্রাইভার আমির। আপারে নিতে আসছি। স্যার কইলো।"

"আমি প্যারেন্ট কল করেছিলাম।" স্যার লোকটার কথা হজম করতে পারেনি এখনো।

"স্যার মনে হয় নতুন।" আমির ভাই হাসি চাপতে চাপতে পকেট থেকে শ্রাবণীর বাবার কার্ড বের করে প্রক্টরকে দিলো, "আমার স্যার ব্যস্ত মানুষ। এসব কাজে উনি আসেন না।"

স্যার কার্ডটা হাতে নিয়ে দেখলো, বড়ো করে লেখা "তৌফিকুল ইসলাম"। একটা ছোটো ঢোঁক গিললেন তিনি, "নিউ সায়েন্সের তৌফিকুল ইসলাম?"

"আসসা তাইলে আপনে অত নতুনও না।" আমির ভাইয়ের রসিকতা শেষ হয় না।

"এক্সকিউজ মি! জাস্ট বিকজ... উনি আমাদের ফান্ডের একজন... বড়ো ডোনার, তার মানে এই না যে আপনি যা মন চায় তাই বলবেন।" স্যার কয়েকবার আটকালো কথাটা বলতে। আটকানোরই কথা। বেশ সাহসী কথাই বলেছেন। "আরেকবার শ্রাবণী কিছু করলে আমি তাকে এক্সপেল করতে বাধ্য হবো। এতে আমাদের ডোনেশন হারালেও কিছু আসে যায় না।"

"স্যার।" এবার আমির ভাইই হতাশ, "আমি খালি একজন ড্রাইভার। আমাকে এডি বলে লাভ কী?"

শ্রাবণীর দিকে তাকালো স্যার। শ্রাবণী চোখের চাহনি দিয়েই বুঝিয়ে দিলো এমন আর কখনো হবে না। আপাতত মাফ করে দেওয়া হোক।

* * *

গাড়িতে আধশোয়া হয়ে আছে শ্রাবণী, চোখেমুখে হতাশা আর হাল ছেড়ে দেয়ার ভাব স্পষ্ট। তার ড্রাইভার আমির ভাই গাড়ি চালাতে চালাতে ফোনে কথা বলছে খুব আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পরপর তার "জি ম্যাডাম" শোনা যাচ্ছে, যার মানে শ্রাবণীর মায়ের সাথেই কথা চলছে। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে বাসায় কেউ আসবে আজকে।

প্রতিদিন ভার্সিটির পর শ্রাবণী বাবার অফিসে যায় বাবাকে পিক করতে। কখনো কখনো বাবা গাড়িতে করে আসে তার সাথে। কখনো শ্রাবণী একাই বাসায় যায়। কোনো ঠিক নাই। আজও তাই করছে সে। শ্রাবণীর গাড়ি যখন তৌফিক টাওয়ারের সামনে দাঁড়ায়, শ্রাবণী অভ্যাসবসত বিরাট বিল্ডিংটার দিকে তাকায়। একটা সময় এই পাহাড় সমান বিল্ডিংটার পুরাটাই বাবার "নিউ সায়েন্সের" আন্ডারে ছিলো। এখন প্রতি ফ্লোরেই কোনো না কোনো অফিস। নিউ সায়েন্সের অফিস কেবল টপ ফ্লোরেই। কিছু ঝামেলার কারণে বাকি ফ্লোরগুলো বাবার ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাবা বা মা কখনো বলে নাই ঝামেলাটা কী। খালি বলেছে শ্রাবণী যখন ছোটো

ছিলো তখন নাকি তাদের পরিবার অনেক সচ্ছল ছিলো। শ্রাবণী প্রায়ই ভাবে, তার বাবা সচ্ছল না থেকেই যেই ক্ষমতার মালিক, না জানি সচ্ছল থাকলে ব্যাপারটা কেমন হতো।

শ্রাবণীর সাথে আমির ভাইও লিফটে উঠে। আজকে আর বাবার রাগ থেকে মুক্তি নাই, আমির ভাইয়ের চাপা হাসি দেখে বুঝতে পারে সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টপ ফ্লোরে চলে আসে তারা। এই ফ্লোরে মূলত সারি সারি ল্যাব। বড়ো বড়ো শকপ্রুফ কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যস্ত ল্যাব কোট পরা বিজ্ঞানীদের। শ্রাবণীর জন্য এসব খুবই সাধারণ দৃশ্য। কালো রাজকীয় টাইলসে খটখট শব্দ তুলে সে সোজা করিডোরের শেষ মাথায় বাবার অফিসের দিকে এগিয়ে গেলো।

দরজার হাতল ঘুরিয়ে রুমে ঢুকতেই দেখতে পেলো বাবা বেশ মেজাজ খারাপ করে কার সাথে যেন কথা বলছে ইংলিশে।

"আই টোল্ড ইউ, উই নিড মোর টাইম। আই উইল গিভ ইট অল ব্যাক টু ইউ।"

ওইপাশ থেকে খুব জোরে কে যেন চ্যাঁচামেচি করছে। কী বলছে, সেটা অবশ্য শ্রাবণী ঠাহর করতে পারলো না।

"ইউ নো হোয়াট? ফাক অফ! ইউ উইল গেট দা মানি হোয়েন আই ওয়ান্ট ইউ টু গেট ইট!" রীতিমতো গালি দিয়ে ফোন রেখে দিলো তৌফিকুল ইসলাম। ফোন রেখে দরজার দিকে তাকাতে দেখে শ্রাবণী আর আমির ভাই দাঁড়ানো। শ্রাবণীকে নিয়ে বাবার সামান্য ভ্রুক্ষেপ নেই। সরাসরি আমির ভাইয়ের দিকে তাকালো সে।

"রাতুল কি রেন্ট তুলেছে?" তৌফিক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন আমিরকে।

"না স্যার, এখনো বলা হয়নি।"

শ্রাবণী আবার তার বাবাকে রাগে জ্বলে উঠতে দেখলো, "রাস্তায় যখন তোমার লাশটা পড়ে থাকবে তখন রেন্ট নিয়ো তুমি!"তৌফিক সাহেব হাতের ফোনটা ছুঁড়ে মারে আমিরের দিকে। । আমির ভাই ফোনটা ক্যাচ

ধরে ঐ ফোন দিয়েই তাদের ম্যানেজার রাতুলকে ফোন দেয়। রুম থেকে বের হতে হতেই কথা বলা শুরু করে,, "রাতুল স্যার, বড়ো স্যার বলতেছিলো রেন্টটা তুলে ফেলতে।"

আমির ভাইয়ের কথা শুনে বাবা আবার চিৎকার করে উঠে, "এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন সব তুলে ফেলে। আর নাহলে তাকে আমার দরকার নাই, জানিয়ে দাও।"

আজকের দিনেই ভার্সিটিতে ঝামেলাটা হতে হলো, এই ভাবতে ভাবতে চেয়ার টান দিয়ে বসলো শ্রাবণী। তার দেখাদেখি তৌফিক সাহেবও চেয়ারে বসলেন। তিনি পুরো অফিস বেশ শাসনেই রাখেন। নানান ঝামেলায় প্রায়ই মেজাজ খারাপ থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ মাথা ঠান্ডা করার জন্য টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। শ্রাবণীর দেখাদেখি টেবিলের এপাশে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দেন তৌফিক সাহেব।

"সরি", মাথা না তুলেই শ্রাবণীর সাথে কথা শুরু করেন তিনি। শ্রাবণী টেবিলে রাখা পানির গ্লাসটার উপর থেকে ছোটো ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গ্লাসটা তার বাবার দিকে এগিয়ে দিলো, কিছু না বলেই। তার বাবা গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "আজকে রাব্বীকে বাসায় ডেকেছি।"

শ্রাবণী গ্লাসটা টান দিয়ে নিজের কাছে ফেরত আনলো তার বাবা নেওয়ার আগে। স্পষ্টতই, শ্রাবণীর বিষয়টা ভালো লাগে নাই, বুঝতে পারলো তৌফিক সাহেব।

"তোকে আগেই বলেছি, এটা নিয়ে আমি একটা কথাও শুনতে চাই না।" শ্রাবণী বাবার গলায় কিছুক্ষণ আগের গম্ভীর ভাব টের পেলো।

"তোমাকেও আমি বলেছি আমার নিজের কিছু প্ল্যান আছে।" শ্রাবণীও সমানভাবে গলা গম্ভীর করে উত্তর দিলো। রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে তার।